The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

আব্বাসীয় আমলে অঙ্কিত মানচিত্রসমূহ : একটি পর্যালোচনা

[Maps Drawn During the Abbasid Period: An Overview]

Gulshan Akter
PhD Researcher, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 18 June 2025
Received in revised: 22 February 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Map, Drawn, During, Abbasid, Period.

ABSTRACT

The History of maps is ancient. Cartography or Maps drawn is defined as the science and art of making maps or geographical representations showing spatial concepts at various scales. Maps convey geographic information about a place and can be useful in understanding topography, weather and culture, depending upon the type of map. Early forms of cartography were practiced on clay tablets and cave walls. Today, maps can show a plethora of information. Modern Cartography began with the advent of a variety of technological advancements. The invention of tools like the compass, telescope, the sextant, quadrant and printing press all allowed for maps to be made more easily and accurately. And behind these modern developments, the dedication, hard work, continuous pursuit of knowledge and discoveries of Muslim geographers, sailors and travelers of the Abbasid period are considered the foundation. Since ancient times, people have been using maps to describe places, land and various features of the world. Cartography underwent an important development during the Abbasid period. Muslim geographers improved cartography by gathering knowledge from Greek, Indian and other traditions. The invention of paper made cartography more accessible. Famous geographers such as al-kindi, Ibn Hawqal, al-Idrisi and al-Biruni etc contributed to cartography during the Abbasid period. Muslim geographers used knowledge of astronomy, mathematics and geometry to map the shape, size and various regions of the world. They not only compiled existing knowledge but also invented new methods and techniques to create new maps. Thus the history of maps has evolved through many evolutions to its present form. It`s an important part of human knowledge and experience, which helps in understanding space, land and the world.

১. ভূমিকা

ম্যাপ বা মানচিত্র হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দৃশ্যমান গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা। এটি কোনো দেশ, শহর-নগর, বন্দর, রাস্তা বা এলাকার একটি চিত্র বা নকশা, যা একটি সমতল পৃষ্ঠে উপস্থাপন করা হয়। প্রাচীনকালে কাপড়ের উপর বা কাগজের ছবি এঁকে ভূমি বা অঞ্চলের চিত্র তৈরি করা হতো। যা আজকের আধুনিক মানচিত্রের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। বহুকাল থেকেই মানচিত্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক মানচিত্র নামে এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকলেও প্রতিটি মানচিত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান, রাস্তা-ঘাট, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির রূপরেখা চিহ্নিতকরণ। মানচিত্র মনুষ্য জাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইসলামপূর্ব যুগে প্রাচীন ব্যবিলন, গ্রিস, রোম, মিসর, চীন ও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে আদিম জনগণ অজ্ঞাত থাকার কারণে তাদের তৈরি মানচিত্রে বক্রতা উপেক্ষা করা হয়েছিল। উক্ত মানচিত্রসমূহ অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংবলিত ছিল। ইসলাম আগমনের পর সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে উন্নত ও আধুনিক মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়াসে মুসলিম মনীষীগণ সচেষ্ট হন। টলেমী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র মুসলিম ভূগোলবিদ দ্বারা সংশোধন ও পরিমার্জিতকরণের ফলে দীর্ঘদিন যাবত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করে চলছে। আব্বাসীয় আমলে মানচিত্র অঙ্কনে এক নয়া দিগন্তের সূচনা হয়। এ সময় ভূগোল ও মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যার স্বর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটে। আব্বাসীয় খলীফাগণের বিশেষত খলীফা আল-মামূনের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম মনীষী, ভৌগোলিক ও নাবিকগণ সকলেই বিশ্বভ্রমণপূর্বক তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা অঙ্কন

করে গেছেন এসব মানচিত্রে। আল-কিন্দি, আল-ইসতাখরী, ইব্ন হাওকাল, আল-ইদরীসী, আল-বিরূনী প্রমুখ ভৌগোলিকগণ বিশ্ব মানচিত্র ও আঞ্চলিক মানচিত্র অঙ্কনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নাবিকদের সমুদ্রভ্রমণে দিক নির্ণয় ও স্থান নির্দিষ্টকরণ এবং খলীফাগণের পরামর্শে রাজদরবারের প্রয়োজনানুসারে ও ভৌগোলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে মানচিত্রসমূহ প্রভূত সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

২. ম্যাপ বা মানচিত্রের পরিচয়

মানচিত্র শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Map, যা ল্যাটিন শব্দ Mappa থেকে এসেছে। ম্যাপ বা মানচিত্র ফারসী শব্দ 'Carte' থেকে উদ্ভূত। এর আরবী প্রতিশব্দ 'খারীতা' (خريطة), যা ফারসী ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে।[১] মধ্যযুগে আরবীতে পৃথিবীর মানচিত্র বুঝাতে *জুগরাফিয়্যা*, *জাগরাফিয়্যা* বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার হতো। এছাড়া গ্রিক শব্দের আরবী পরিভাষা 'সুরাতুল আরদ', 'রসমূল আরদ', 'সিফাতুদ দুন্য়া', 'আশকালুল আরদ', 'লাওহর রাস্ম' প্রভৃতি শব্দও মানচিত্র হিসেবে প্রচলিত ছিল। ম্যাপ বা মানচিত্র দ্বারা একখণ্ড কাপড়কে বুঝানো হতো। একখণ্ড কাপড় যেমন কোনো কিছুকে আবৃত বা ঢেকে রাখে ঠিক তেমনি একটি মানচিত্র ছোট একটি কাগজে সমগ্র পৃথিবী বা এর কোনো অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে।

'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে মানচিত্র সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে,

الخريطة ج خرائط : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه من صحف و نحوها ... Chart

'মানচিত্র (বহুবচন) মানচিত্রসমূহ: 'চামড়া বা অনুরূপ শক্ত উপাদান দ্বারা তৈরি একটি নকশা যা সংবাদপত্র বা অনুরূপ কিছু পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।'[২]

মানচিত্র বলতে আমরা কোনো এলাকার মানসম্মত চিত্রকে বলতে পারি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্কেল এবং অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে সমতল কাগজের উপর বা অন্য কোনো সমতলের উপর অঙ্কিত সমগ্র পৃথিবী অথবা এর কোনো অংশের প্রতিরূপই হলো মানচিত্র।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবী অথবা পৃথিবীর কোনো অংশকে কাগজে দেখানোই মানচিত্র।

পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন অংশের সীমা, আয়তন, অবস্থান এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব বুঝানোর জন্য নির্দিষ্ট মাপনীর *(Scale)* প্রেক্ষিতে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের অংশবিশেষের যে নকশা প্রস্তুত করা হয়, তাকে মানচিত্র বলে। ভূগোলবিদদের মতে, প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে সমতল কাগজের উপর অঙ্কিত সমগ্র পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে।

'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে মানচিত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

الخريطة: ما يرسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه.

'পৃথিবী পৃষ্ঠ বা এর কিছু অংশ যার উপর অঙ্কিত করা হয় সেটিই মানচিত্র।'[৩]

'আল-মিসবাহুল মুনীর' গ্রন্থে মানচিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الخريطة شبه كيس يشجر من أديم وخرق والجمع (خرائط)

'মানচিত্র হলো চামড়া এবং বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তৈরি ব্যাগের ন্যায়, বহুবচন (মানচিত্রসমূহ)।'[৪]

A Modern Dictionary of Geography গ্রন্থে মানচিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

Map. A representation on a flat surface (usually of proper) of the features of part of the earth`s surface, drawn at a specific scale. It involves certain degrees of generalization and exaggeration, of selective emphasis and stylized representation, according to the scale and detail involved. Maps may be prepared in many different forms and for a wide variety of purposes. For example, they can range from general topographic maps to selective representation of things such as Atlantic weather systems, the distribution of population density at a national level or a city`s public transport network.

'মানচিত্র, (সাধারণত যথাযথ) পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের সমতল অংশের (সাধারণত যথাযথ) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের একটি নির্দিষ্ট স্কেলে অঙ্কিত একটি উপস্থাপনা। এতে স্কেল এবং বিশদ বিবরণ অনুসারে নির্দিষ্ট মাত্রার সাধারণীকরণ এবং অতিরঞ্জন, নির্বাচনী গুরুত্ব এবং শৈলীকৃত উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। মানচিত্র বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এগুলি সাধারণ ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র থেকে শুরু করে আটলান্টিক আবহাওয়া ব্যবস্থা, জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যার ঘনত্বের বন্টন বা শহরের গণপরিবহন নেটওয়ার্কের মতো বিষয়গুলোর নির্বাচনী উপস্থাপনা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।[৫]

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানচিত্রের সংজ্ঞায় বলা যায়,

> A map is a representation on a plane surface at an established scale, of the physical features, (natural, artificial or both) of a part or the wholeof the earth`s surface, by the use of signs and symbols, and with the method of orientation indicated. Also a similar represantation of heavenly bodies.
>
> 'সমগ্র পৃথিবী বা এর অংশ অথবা নভোমণ্ডলের তথ্যাদি প্রতীক চিহ্ন, অভিক্ষেপ ও অনুপাত বা স্কেলের সাহায্যে কোনো সমতল পৃষ্ঠে প্রতিমূর্তি সদৃশ প্রতিফলন এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যেন এর অবস্থান বিন্দুগুলি ভূ-পৃষ্ঠে বা আকাশের তথ্যাদির সঠিক অবস্থান নির্দেশ করে। সমতল পৃষ্ঠে এই প্রতিফলনকে মানচিত্র বলে।'[৬]

ভূগোলশাস্ত্রে মানচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিকগণ মানচিত্রে ভৌগোলিক তথ্য, উপাত্ত প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করে থাকেন। মানচিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা অধ্যাপক মিলার বলেন,

> I referred to the map as a tool, in reality it is a whole bay of tools containing more ingenious devices than a boy scout`s knife and if properly used it will open almost any geographical problem ...
>
> 'আমি মানচিত্রকে ব্যবহারিক কলাকৌশল হিসেবে নির্দেশ করেছি। বাস্তবক্ষেত্রে এইগুলো সাগর-সদৃশ্য ব্যাপক কলাকৌশল। যদি এগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এগুলো প্রায় সকল ভৌগোলিক সমস্যার দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।'

৩. মানচিত্রের ব্যবহার এবং গুরুত্ব

ভূগোল ও পরিবেশসহ অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে মানচিত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বই-পুস্তকে লেখনির মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য যেমন তুলে ধরা হয়, ঠিক তেমনি মানচিত্রের মাধ্যমেও বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা যায়। তাই মানচিত্রের ব্যবহার এবং গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানচিত্রের প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপ:

১. যে কোনো অঞ্চল বা দেশের ভৌগোলিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে, স্বল্প সময়ে এবং বাস্তবসম্মতভাবে জানার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কোনো স্থানের অনেক তথ্য একই সঙ্গে জানা যায়।

২. মানচিত্রে স্কেল দেওয়া থাকে বলে দু'টি স্থানের দূরত্ব যে কোনো ব্যক্তি নিজেই নির্ণয় করতে পারেন। ফলে দূরত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা যায়।

৩. যে কোনো অঞ্চলের গ্রাম, শহর বা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি তথ্য সম্পর্কে জানা যায়।

৪. কোনো স্থানের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি ইত্যাদির অবস্থান জানার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

৫. বিভিন্ন ধরনের তথ্য তুলে ধরার জন্য। যেমন- কোনো স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে আবহাওয়া মানচিত্র, খনিজ সম্পদের অবস্থান দেখানোর জন্য খনিজ মানচিত্র, জনসংখ্যার বিস্তরণ দেখানোর জন্য জনসংখ্যা মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

৬. সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো স্থান কত উচ্চতায় অবস্থিত তা তুলে ধরার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

৭. সমুদ্রে জাহাজ চালাতে কিংবা আকাশ পথে বিমান চালাতে মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

৮. যুদ্ধ ক্ষেত্রের কৌশল নির্ধারণ, শত্রুর অবস্থান নির্ণয় করার জন্যও মানচিত্র প্রয়োজন। এছাড়া ভ্রমণের জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। মানচিত্র ভ্রমণ পরিকল্পনার পাশাপাশি গাইডের ভূমিকা পালন করে।

৯. বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। যেমন: শিল্প-কারখানার অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

১০. যে কোনো ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও কোনো দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানচিত্রের ব্যবহার এবং গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। একই সাথে মানচিত্র পঠন ও পাঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. মানচিত্রের উপাদান

মানচিত্রের প্রধান উপাদান ৫টি। যেমন-

১. সীমানা *(Boundary)*: প্রতিটি মানচিত্রের চারিপাশে নির্দিষ্ট সীমানা থাকবে।

২. উত্তরদিক *(North Line)*: প্রতিটি মানচিত্রের উত্তর দিক বা উত্তর বা (↑) এই অ্যারোচিহ্নের মাধ্যমে দেখাতে হবে। অ্যারোচিহ্ন সর্বদা মানচিত্রের উপরের দিকে থাকবে।

৩. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা *(Latitude and Longitude)*: যে এলাকার মানচিত্র সেই এলাকার অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা সঠিকভাবে দেখাতে হবে।

৪. স্কেল *(Scale)*: মানচিত্রটি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্কেলে অঙ্কণ করতে হবে। মানচিত্রে যে কোনো দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব এবং ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূমিভাগে ঐ দুটি স্থানের মধ্যে প্রকৃত দূরত্বের যে অনুপাত বা সম্পর্ক তাকে মাপনী বা স্কেল বলে।

৫. শিরোনাম ও সাংকেতিক চিহ্ন *(Headings and Symbols)*: মানচিত্রের শিরোনাম উল্লেখ করে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মানচিত্রের বিষয়াদি সঠিক সংকেতের সাহায্যে উল্লেখ করতে হবে।

৫. মানচিত্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি

মানচিত্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যথা:

১. মানচিত্রের স্কেল নির্ণয়: স্কেলের সাহায্যে মানচিত্রের আকার নির্দ্ধারণ করা হয়।

২. প্রয়োজন অনুসারে অভিক্ষেপ নির্বাচন ও অঙ্কন।

৩. মানচিত্রে তথ্যাদির প্রকাশ। প্রাকৃতিক তথ্যাদি যেমন বন্ধুরতা *(relief)* ও জলভাগ *(hrydrography)* এবং মানুষ *(human)* সম্বন্ধীয় তথ্যাদি। যেমন ভূমি ব্যবহার *(land use)*, বসতবাটি *(sattlement)* এবং পরিবহন মানচিত্রে পরিষ্কার ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করার জন্য পদ্ধতি *(technique)* নির্ণয় করা। মনে রাখা প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেল কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে। শিরোনাম ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের জন্য বর্ণের আকার ও অবস্থানের দিকেও নজর দিতে হয়।

৪. রঙ, লিথুগ্রাফিক পদ্ধতি *(lithographic process)* এবং মুদ্রণ: অতীতে মানচিত্রে কেবলমাত্র সাদা ও কালো রঙ বিন্যাসের দ্বারা মুদ্রণ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের রঙের দ্বারা পূর্বের বর্ণিত মানচিত্র অপেক্ষা অনেক তথ্য মানচিত্রের প্রাঞ্জলতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নষ্ট না করে প্রকাশ করা যায়। এ কারণে মানচিত্রে রঙ নির্ধারণ, বিভিন্ন প্লেটের মাধ্যমে মুদ্রণ এবং বিভিন্ন রঙ ও মাধ্যমের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।[৭]

৬. মানচিত্রের প্রকারভেদ

সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্য মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। যেসব বিষয় মানচিত্রে দেখানো হয় সে সকল তথ্যের ওপরই নির্ভর করে মানচিত্রের প্রকৃতি। স্বতন্ত্র বিষয়গুলো আলাদা মানচিত্রে তুলে ধরা হয় বলে বিভিন্ন প্রকার মানচিত্রের প্রচলন হয়েছে। এ সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মানচিত্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

ক. স্কেলের ভিত্তিতে *(According to Scale)*

খ. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে *(According to Purposes)*

ক. স্কেলের ভিত্তিতে মানচিত্র চার প্রকার। যথা–

১. মৌজা মানচিত্র *(Cadastral Map)*;

২. ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র *(Topographical Map)*;

৩. দেওয়াল মানচিত্র *(Wall Map)* এবং

৪. ভূ-চিত্রাবলী *(Chorographical or Atlas Map)*।

উক্ত মানচিত্রাবলী সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো:

৬.১ মৌজা মানচিত্র

মৌজা বা *Cadastral* শব্দটির আভিধানিক অর্থ সম্পত্তি নথিভুক্ত করা। সুতরাং সম্পত্তির মালিকানার হিসাব রাখার জন্য যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে মৌজা মানচিত্র বলে। এ ধরনের মানচিত্র সাধারণত গ্রামে ব্যবহৃত হয়। মৌজা মানচিত্র একটি, দুইটি বা তিনটি গ্রাম নিয়ে হতে পারে। আবার একটি গ্রামের অংশবিশেষ নিয়েও হতে পারে। এই মানচিত্রের স্কেল সাধারণত ১৬ = ১ মাইল থেকে ৩২ = ১ মাইল পর্যন্ত হয়।

৬.২ ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র

ভূ-সংস্থানিক মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা, বনভূমি, নদ-নদী, শহর, বন্দর, ঘর-বাড়ি, ভূমির ব্যবহার, পরিবহন প্রভৃতি দেখানো হয়। এ ধরনের মানচিত্রে প্রতীক বিন্দু এবং বিভিন্ন রং দিয়ে দেখানো হয়। ভূ-সংস্থানিক মানচিত্রের সুবিধা হলো কোনো এলাকা সম্পর্কে একসঙ্গে সবকিছু জানা যায়। এ ধরনের মানচিত্রের স্কেল ১=১ মাইল থেকে ১৪" = ১ মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

৬.৩ দেওয়াল মানচিত্র

সমগ্র পৃথিবী, মহাদেশ বা দেশের তথ্যাদি বড় কাগজে সহজে উপস্থাপনের জন্য দেওয়াল মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। দেওয়াল মানচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ বা অফিসের দেওয়ালে অথবা বাড়ির দেওয়ালে লাগানো হয়। এ ধরনের মানচিত্রে সাধারণত ১ = ৩০০ মাইল পর্যন্ত দেখানো হয়ে থাকে।

৬.৪ ভূ-চিত্রাবলী

ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, কৃষিজ, খনিজ, শিল্প, শহর, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি বিভিন্ন রং ও চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একে মানচিত্রের সংকলন গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। ভূ-চিত্রাবলী সবচেয়ে ছোট স্কেলে অঙ্কন করা হয়। এ মানচিত্রের স্কেল সাধারণত ১: ১,০০,০০০ বা ১: ১০,০০,০০০ হিসেবে দেখানো হয়।

খ. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মানচিত্রকে নিম্ন লিখিতভাবে ভাগ করা যায়-

১. বন্ধুরতা মানচিত্র *(Relief Map)*: যে মানচিত্রের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের সমতার ঢাল, পাহাড়, পর্বত, হ্রদ এবং পৃথিবীর কোনো স্থান কত উঁচু বা কত নিচু এক কথায় পৃথিবীর কাঠামো প্রদর্শন করে তাকে বন্ধুরতা মানচিত্র বলে।

২. ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র *(Geological Map)*: ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রে কোনো অঞ্চলের মৃত্তিকা ও অভ্যন্তরস্থ স্তর গঠন দেখানো হয়।

৩. উদ্ভিজ্জ মানচিত্র *(Vegetation Map)*: পৃথিবীর প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জের বন্টন এ মানচিত্রে দেখানো হয়।

৪. জ্যোতিষ্ক মানচিত্র *(Astronomical Map)*: আকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির অবস্থান যে মানচিত্রে দেখানো হয় তা হলো জ্যোতিষ্ক মানচিত্র।

৫. জলবায়ু মানচিত্র *(Climate Map)*: যে মানচিত্রে একটি দেশ বা মহাদেশের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা দেখানো হয় তাকে জলবায়ু মানচিত্র বলে। যেমন- মৌসুমী জলবায়ুর মানচিত্র।

৬. আবহাওয়া মানচিত্র *(Weather Map)*: এই মানচিত্রে কোনো দেশ বা অঞ্চলের আবহাওয়ার স্বল্পকালীন অবস্থা প্রদর্শন করা হয়। যেমন- দৈনন্দিন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ।

৭. মৃত্তিকা মানচিত্র *(Soil Map)*: এ ধরনের মানচিত্রে কোনো অঞ্চলের বা দেশের মৃত্তিকার প্রকারভেদ, শিলার পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি দেখানো হয়।

৮. সামরিক মানচিত্র *(Military Map)*: সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা জন্মায় যে মানচিত্র তাকে সামরিক মানচিত্র বলে।

৯. সাংস্কৃতিক মানচিত্র *(Cultural Map)*: এ ধরনের মানচিত্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার বন্টন দেখানো হয়। ঐতিহাসিক জাতি-ধর্ম বিন্যাস প্রভৃতি সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অন্তর্গত।

১০. অর্থনৈতিক মানচিত্র *(Economic Map)*: এ ধরনের মানচিত্রে অর্থ উপার্জনের উৎসভিত্তিক বিষয়গুলো দেখানো হয়। যেমন- কৃষি, প্রাণিজ, বনজ, শিল্প ও খনিজ দ্রব্য সম্পর্কিত তথ্য।

১১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মানচিত্র *(Political and Administrative Map)*: যেসব মানচিত্রে বিভিন্ন দেশের সীমানা, অবস্থান, প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি দেখানো হয় সেগুলো রাজনৈতিক মানচিত্র।

ভৌগোলিকগণ মানচিত্রের ব্যবহার প্রয়োজনানুসারে করে থাকেন। মানচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ১. বৃত্তি *(function)* বা অভিপ্রায়, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য *(purpose)* এবং ২. স্কেল বা দূরত্ব নির্ধারণ। এই দুই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানচিত্রের শ্রেণিভাগ করা হয়ে থাকে।

বৃত্তি বা অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে মানচিত্রকে দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়। ১. প্রাকৃতিক *(Physical)* এবং ২. সাংস্কৃতিক *(Cultural)* মানচিত্র।

১. প্রাকৃতিক *(Physical)* মানচিত্র: প্রাকৃতিক মানচিত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত বিষয়াদি প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে *(Topographical map)* ভূমির বন্ধুরতা বা ভূ-পৃষ্ঠের আকার ফুটে উঠে। এটি সাধারণত বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রকে বুঝায়। এই প্রকার মানচিত্র সুষ্ঠু জরিপের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয় এবং ভূ-প্রাকৃতিক তথ্যাদি ছাড়াও কৃষ্টিবিষয়ক তথ্যাদি এই সকল মানচিত্রে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। এই সকল মানচিত্রে সাধারণত সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে বন্ধুরতা প্রকাশ করা হয়।

বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের একটি বা দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরিবহনের ক্ষেত্রে ভূমির বন্ধুরতার প্রভাব লক্ষ্য করার জন্য কেবলমাত্র সমোন্নতি রেখা এবং বিভিন্ন রাস্তাঘাট, রেললাইন ও নদীপথ প্রকাশ করা হয়।

জলবায়ু বিষয়ক মানচিত্রে জলবায়ু যেকোনো উপাদান এবং আবহাওয়া মানচিত্রে কোনো স্বল্প সময়ের আবহাওয়ার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়। নভোমণ্ডলের তথ্যাদি জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ ও এদের বন্টন উদ্ভিজ বিষয়ক মানচিত্রে; ভূতাত্ত্বিক তথ্যাদি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে এবং মৃত্তিকার বন্টন মৃত্তিকা মানচিত্রে প্রকাশ করা যায়।

২. সাংস্কৃতিক *(Cultural)* মানচিত্র: সাংস্কৃতিক মানচিত্রে সাংস্কৃতিক তথ্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক তথ্য এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কোনো দেশের বা এলাকার ভূমির ব্যবহার সে দেশের বা এলাকার মানচিত্রে প্রকাশিত হলে সে মানচিত্রগুলিকে ভূমি ব্যবহার *(Land utilization)* মানচিত্র বলে। যে সব মানচিত্রে প্রতীক চিহ্ন, বিন্দু *(Dot)*, ছায়াপাত *(Shading)* প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উপাত্তের বন্টন প্রকাশ করা হয় সেগুলিকে বন্টন মানচিত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে প্রায় সকল মানচিত্র এই পর্যায়ে পড়ে। কেননা প্রায় সকল মানচিত্রে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন তথ্যের বৈশিষ্ট্যের আপেক্ষিক *(relative)* অবস্থান বা বন্টন প্রকাশ পায়। যেমন- উদ্ভিজ্জ মানচিত্রে উদ্ভিদের বন্টন, মৃত্তিকা মানচিত্রে মৃত্তিকা, গমের বন্টন মানচিত্রে গম, জনসংখ্যার বন্টন মানচিত্রে জনসংখ্যার বন্টন বিন্দু বা ছায়াপাতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়-

স্কেলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রকে প্রধানত দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়। যেমন

১. বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র : এক্ষেত্রে মাইল ধ্রুবক কিন্তু ইঞ্চির পরিমাণ ১ (এক) থেকে বৃহৎ হয়ে থাকে। যথা ১ মাইলে ১″, ১ মাইলে ২½, ১ মাইলে ৬″, ১ মাইলে ১৬″ ইত্যাদি।

২. ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র: এ প্রকার মানচিত্রের স্কেলের ক্ষেত্রে ইঞ্চিকে ধ্রুবক ধরা হয়। ১″- ৪ মাইলে, ১″- ১৬″ মাইল ইত্যাদি স্কেলের মানচিত্র এই শ্রেণির অন্তর্গত।

যথেষ্ট বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রকে প্ল্যান বলা হয়। যথা ১/৫০০ অথবা ১/১২৫০ স্কেলের মানচিত্র। এ সব প্ল্যানে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি অতিরঞ্জন ছাড়া এবং ভূমির বাস্তব তথ্যাদির সঠিক আকার প্রকাশ পায়। প্ল্যানে অভিক্ষেপের প্রয়োজন আদৌ পড়ে না। অন্য দিকে ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্রে তথ্যাদি সাধারণভাবে *(generalized)* সঙ্কেত চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং এ সব মানচিত্র (যেমন ভূচিত্রাবলীয় মানচিত্র) অভিক্ষেপের সাহায্যে অঙ্কন করা হয়।

বর্তমানে স্কেল অনুযায়ী মানচিত্রকে অনেক সময় ক্ষুদ্র, মাধ্যম ও বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। এক শ্রেণি হতে অন্য শ্রেণিকে পৃথক করার মূল্যমানের ক্ষেত্রে মতদ্বৈত্য লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ব্রিটিশ সংস্থা নিম্নলিখিত মূল্যমানের মানচিত্রের নিম্নোক্ত শ্রেণিবিভাগ করেছেন-

নাম	অর্ডিন্যান্স জরিপ ডাইরেক্টরেট	সাময়িক জরিপ ডাইরেক্টরেট	বৈদেশিক জরিপ
বৃহৎ স্কেল	১/১০,৫০০	১/৭৫,০০০	১/২৫,০০০
মধ্যম স্কেল		১/৭৫,০০০ হতে	১/২৫,০০০
		১/৬০০,০০০	১/১,২৫,০০০
ক্ষুদ্র স্কেল	১/২৫০,০০০	১/৬০০,০০০	১/২৫,০০০

উপরোক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও অনেক সময় ভূচিত্রাবলীর মানচিত্রকে চতুর্থ মানচিত্রের শ্রেণির মানচিত্র বলে ধরা হয়।

মানচিত্রের প্রদর্শিত বিষয় এবং স্কেলের পার্থক্য উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানচিত্রকে আবার নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

১. ক্যাডাস্ট্রাল *(Cadastral)* বা মৌজা মানচিত্র: বৃহত্তম স্কেলের মানচিত্রকে এ শ্রেণির মানচিত্রের পর্যায়ে ধরা হয়। মূলত এগুলিকে প্ল্যান বলে। এসব যেহেতু পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র অংশের প্রতিরূপ *(Representation)* সেহেতু এই সকল মানচিত্রে কোনরূপ অভিক্ষেপ অঙ্কনের প্রয়োজন হয় না। অর্ডন্যাস সার্ভের যথাক্রমে ৬″= ১ মাইল এবং ২৫″= ১ মাইল; বাংলাদেশের ১৬″= ১ মাইল হতে ৬৪″ = ১ মাইল এবং অন্যান্য দেশের ১: ২০,০০০ বা এটি অপেক্ষা কম অনুপাতের স্কেলের মানচিত্র এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব মানচিত্রে দালানকোঠা, জমির মালিকানার সীমানা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

২. স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক *(Topographical)* মানচিত্র: এই সকল মানচিত্রের স্কেল সাধারণত ১: ২০,০০০ হতে ১: ১,০০০,০০০। এই মানচিত্রগুলির জন্য অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হয় এবং এই অভিক্ষেপের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানচিত্র সংযুক্ত করা যায়। যেহেতু এই সব মানচিত্রের স্কেল বৃহৎ সেহেতু একটি শীটে কোনো একটি দেশের মানচিত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই সকল মানচিত্রের স্কেল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। অস্ট্রেলিয়ায় এই সকল মানচিত্রের স্কেল ১″- ১ মাইল; ১″= ৪ মাইল এবং ১″= ৮ মাইল এবং ব্রিটেন, বাংলাদেশ, ভারত ও ১″

পাকিস্তানে ১″,$^{১}/_{২}$ এবং $^{১}/_{২}$ হতে ১ মাইল ধরা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই সকল মানচিত্রের স্কেল ১ : ২,০,০০০, ১ : ১২৫০০০, ১ : ৬২,৫০০ এবং ১ : ২৪,০০০/

স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা, নদনদী, বনজঙ্গল, পরিবহনপথ, শহরবন্দর, বসতবাড়ী, এবং অনেক ক্ষেত্রে জমির ব্যবহার বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন এবং রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই সকল মানচিত্র সামরিক কার্যকলাপে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. আন্তর্জাতিক মানচিত্র *(International Map)*: বিভিন্ন দেশের জাতীয়-স্থানীয়-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র *(National Topographic Map)* লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অভিক্ষেপ ও স্কেল এমনকি ভিন্ন শ্রেণির সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই অসুবিধা দূরিকরণের জন্য বিভিন্ন দেশ একজাতীয় মানচিত্র অঙ্কনের ঐক্যমতে পৌঁছে। এই জাতীয় মানচিত্রের স্কেল, আকার, আকৃতি এবং অভিক্ষেপ একই শ্রেণিতে আন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই মানচিত্রের জন্য স্কেল ১ : ১,০০০,০০০ এবং একই আকারের শীট গ্রহণ করা হয়। এই স্কেল অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র হবে। এই মানচিত্রের ভূমির বন্ধুরতা এবং অন্যান্য তথ্য সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

৪. দেওয়াল *(Wall)* মানচিত্র: ক্লাশরুম বা শ্রেণিকক্ষে কোনো দেশ, মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবীর তথ্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উপস্থাপন করার জন্য বড় আকারের মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই সকল মানচিত্রে বড় আকারের লেখা, মোটা রেখা ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের দ্বারা সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। স্কেলের দিক দিয়া এই সকল মানচিত্র স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক ও ভূচিত্রাবলীর মানচিত্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ে পড়ে।

৫. ভূচিত্রাবলী: এই শ্রেণির মানচিত্র ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র বলিয়া অভিহিত। সমগ্র পৃথিবী, কোন গোলার্ধ বা কোন মহাদেশ এক পাতায় অঙ্কিত করা হয়। এই সকল মানচিত্রের স্কেল সাধারণত ১ : ১,০০০,০০০ বা কোন স্কুল-ভূচিত্রাবলীতে পৃথিবীর মানচিত্রের স্কেল ১: ১০০০,০০০,০০০ হইয়া থাকে। 'টাইমস্ সারভে ভূচিত্রাবলীর স্কেল ১:১,০০০,০০০। ভূচিত্রাবলীতে সাধারণত ভূপ্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করে দেওয়া হয়। এ সকল মানচিত্রে ভূপ্রাকৃতিক, জলবায়ু বিষয়ক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদির খুবই সাধারণ *(Highly generalized)* চিত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

ভূগোলের তথ্যাদির প্রাচুর্যতা এবং এই তথ্যগুলি উন্নত পর্যায়ে প্রকাশের জন্য জাতীয় ভূচিত্রাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে। স্কটল্যান্ডের 'দি রয়্যাল স্কটিশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অ্যাটলাস' কৃত বারথোলোমিউ, জে, জি, ১৯৪৫ সাল, স্কেল ১″-২মাইল ৪৫ সেকশানে অঙ্কিত। 'দি সুমেন কারটাসটো: অ্যাটলাস অব ফিনল্যান্ড' *(The Soumenkartasto atlas of Finland)* প্রথম সংস্করণ ১৮৯৯; চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬১ এর উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'এই ভূচিত্রাবলীর দ্বারা ফিনল্যাডের অধিবাসীগণ নিজেদের দেশকে জানিবে এবং অধিবাসীদের একে অপরকে জানতে সাহায্য করবে। (Proclaimed its object to be to assist the people of Findlan to know themselves and their Country) অ্যাটলাস অব ক্যানাডা প্রথম সংস্করণ ১৯০৬; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৫; অ্যাটলাস ডি ফান্স স্কেল ১ : ১০০০,০০০; 'অ্যাটলাস অব অস্টেলিয়ান রিসোরর্সেস' ১৯৫৪-৬০ স্কেল ১: ৬,০০০,০০০; 'অ্যাটলাস অব আমেরিকান এগ্রিকালচার' ১৯৩৬; 'দি গ্রেট সোভিয়েট অ্যাটলাস', 'অ্যাটলাস অব হেটি বৃটেন অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড.' 'দি রিডারডাইজেস্ট কোমপ্লিট অ্যাটলাস অব ব্রিটিশ অ্যাইসস'; 'ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অব ইন্ডিয়া' ১৯৫১ ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভূচিত্রাবলী।[৮]

৭. মানচিত্রের ইতিহাস

মানচিত্রের ইতিহাস অতি পুরাতন। লক্ষ্য করা যায় যে, আদিবাসীগণ তাদের সহজাত প্রবৃত্তির *(Instinctive Ability)* মাধ্যমে মোটামুটি ঠিক নকশা অঙ্কন করতে পারেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর অতীতকাল থেকে এ প্রকারের প্রয়াস প্রচলিত ছিল। এই নকশাই আদিকালের মানচিত্র বলে অভিহিত করা হয়, যদিও এগুলোকে সংজ্ঞা অনুযায়ী মানচিত্র বলা যায় না। সম্ভবত প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিসরবাসী জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য এ প্রকার মানচিত্র বা নকশা অঙ্কন করেছেন। ভ্রমণকারীগণের পথ নির্দেশের জন্য সহজ ও সরল এ প্রকারের মানচিত্রকে *'ব্যবিলোনিয়ান'* মানচিত্র বলা হয়।[৯] এই সময়ের বহু পূর্ব হতে মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচিত এলাকার খসড়া নকশা বালিতে অঙ্কন করত। অনুমান করা যায় যে, ভৌগোলিক বিবরণের জন্য এরাটোসথেনিস ও টলেমি এ সকল মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

হেরোডোটাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আরিসটোগোরাস এক ব্রঞ্জ ফলকে *(Tablet)* সমগ্র পৃথিবীর পরিধি, সমগ্র সাগর এবং সকল নদ-নদী অঙ্কন করেন। কিন্তু যখন স্পার্টাবাসীগণ অবগত হলো যে ভূমধ্য সাগরের উপকূল হতে পারস্যের রাজধানী সুসা তিন মাসের যাত্রাপথ তখন তারা আরিসটোগোরাসের মানচিত্র সঠিক বলে গ্রহণ করতে রাজী হননি।

গ্রিক বিজ্ঞানীগণ মানচিত্র অঙ্কনকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যান। তাদের মতে, বসবাসকারী পৃথিবী পৃষ্ঠ ভূমধ্য সাগর থেকে খুব দূরে বিস্তৃত নয়। তারা আরো মনে করত যে, পৃথিবী গোলাকৃতির। এরাটোসথেনিস 'পৃথিবী' শীর্ষক মানচিত্রে ৭টি

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা অঙ্কনের মাধ্যমে অনিয়মিত 'গ্রিড' অঙ্কন করেছিলেন। তুলনামূলকভাবে টলেমি নিয়মিত অক্ষাংশে ও দ্রাঘিমাংশের গ্রিড অঙ্কিত করেন। এ সকল মানচিত্রের প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ৪৩ খ্রিস্টাব্দে মেলার ও ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে অরটেলিয়াসের মানচিত্রে উত্তর গোলার্ধের মূলভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দক্ষিণ গোলার্ধের রূপকথার মহাদেশ *(Terra Australis Incognita)* স্থান দখল করে। কুমেরু সাগর ক্যাপ্টেন ফুকের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই প্রাপ্ত ধারণা পরিত্যক্ত হয়।

গ্রিক সভ্যতার পতন ও খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব মানচিত্রের বিপর্যয় ত্বরান্বিত করে। এ সময় মানচিত্রে তথ্যপূর্ণ উপাদান অপেক্ষা কল্পনা প্রসূত চিন্তাধারা উপজীব্য হয়ে ওঠে এবং সমতল পৃথিবী-মতবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেরুজালেমকে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং স্কেলের উল্লেখ মানচিত্রে কদাচিৎ প্রকাশ করা হতো। মানচিত্রের এ সকল বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগে পরিলক্ষিত হতো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে টলেমির ধারণার মাধ্যমে মানচিত্রে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন আসে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে 'আবিষ্কারের মহাযুগ' *(The Great Age of Discovery)* বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বা পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের আবির্ভাব ঘটে। নির্ভুল মানচিত্র প্রকাশ পায় ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের পর যখন হ্যারিসনের ক্রনোমিটার *(Chronometer)* আবিষ্কারের মাধ্যমে দ্রাঘিমাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। পূর্ব-পশ্চিম অবস্থান সম্পর্কে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা সংশোধনের চেষ্টার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের স্থলভাগগুলো নির্ভুলভাবে অঙ্কন করা সম্ভব হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে সাগর-মহাসাগরের এলাকা জাহাজ ও তিমি মাছের চিত্র দ্বারা এবং স্থল ভাগে পাহাড় এবং শহরের প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হতো।[১০]

আধুনিক যুগে প্রায় নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এটি মূলত নতুন জরিপ পদ্ধতি, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, বিমানের সাহায্যে জরিপকৃতআলোকচিত্রের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে পরিবহন, ইলেকট্রনিকস এবং উৎপাদনক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি মানচিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এ সকল ব্যবস্থা হচ্ছে হেলিকাপ্টারের মাধ্যমে বন্ধুর এলাকায় অতি অল্প সময়ে লোকবল ও যন্ত্রপাতির পরিবহন, রেডিও ইনস্ট্রুমেন্ট-টেলুরোমিটার এর মাধ্যমে সার্বক্ষনিক দূরত্ব নির্ণয় এবং আকাশ পরিবহনের সাহায্যে দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয়, মানচিত্র মুদ্রণ ও সংকলনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার ও ফটোলেটারিং যন্ত্র; উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতা এবং সহজ ও প্রাঞ্জল প্রকাশনা মানচিত্রকে নতুন জীবনীশক্তি প্রদান করেছে।

৭.১ আব্বাসীয়-পূর্ব যুগের মানচিত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাথমিককাল থেকেই মানচিত্র ও চার্ট অঙ্কনের ব্যাপারে আরব ভূগোলবিদগণ গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রথমত এই আগ্রহ দেখা দেয় কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে খুঁজে পাওয়া এবং কোনো এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার প্রয়োজনে। সম্ভবত মানচিত্র প্রস্তুতকরণে গ্রিক ধারাবহিকতাও এক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের মানচিত্র ছিল কেবল সূচনা এবং তথ্যাবলীর নিরেট সমাহার মাত্র। পরবর্তীতে নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে মানচিত্র অঙ্কিত হয়। এ সকল মানচিত্রে বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সংযোজিত হওয়া ছাড়াও সহজ সরল পদ্ধতি অবলম্বনে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যাবলী সন্নিবেশপূর্বক মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। উমাইয়া যুগে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক পর্যায়ের মানচিত্র প্রস্তুতকরণ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক মানচিত্রের সমন্বয়ে *'ইরান এ্যাটলাস'* প্রস্তুত করা হয়। এ সকল মানচিত্র এবং স্থানীয় চার্ট সম্পর্কে আল বালাজুরীর ফুতুহুল বুলদান এবং ইব্নুল ফকিহ-এর রচনাবলী থেকে জানা যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল যে স্থলভাগকে একটি মাত্র মহাসাগর পরিবেষ্টন করে আছে। কারণ মুসলমান ব্যবসায়ী, নাবিক, অথবা বিজেতাগণ যে কোনো দিক দিয়েই প্রবেশ করুন না কেন, আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সব দিক থেকেই তারা একটি বিশাল মহাসাগরীয় বিস্তার লক্ষ্য করতেন। তাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় এবং গ্রিক ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী দ্বারা আরো জোরদার হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এমনকি প্রাথমিক যুগের মুসলমান মানচিত্র প্রণেতা যেমন ইব্ন হায়কল, আল-মাকদিসী, আল-ইদরীসী এবং অন্যান্য আরো অনেকের দ্বারা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো, ভারত মহাসাগর স্থলবেষ্টিত হওয়া এবং আফ্রিকার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ থাকা সম্পর্কে টলেমীর ধারণা বাতিল করে দেয়া। তাদের মানচিত্রে নতুনভাবে আবিষ্কৃত সাগর, উপসাগর ও দ্বীপনমূহ স্থান পেতে থাকে।

আর এটা ছিল আরবদের ব্যাপক নৌও-তৎপরতার ফলশ্রুতি। এ সময়ে ইউরোপ এবং ভূ-মধ্যবর্তী অঞ্চলে নৌ-তৎপরতা সম্পর্কে ফিনিশীয়দের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রায় বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। গ্রিক যুগে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নৌ-পথে বিচরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভূমধ্যসাগর এবং উপকূলবর্তী এলাকার মধ্যে সীমিত ছিল।[১১] আব্বাসীয় পূর্ব যুগে সংক্ষিপ্তাকারে মানচিত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

১. গ্রিক-হেলেনীয় ধারা: মানচিত্রবিদ্যার সংগঠিত সূত্রায়ন শুরু হয় গ্রিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের হাতে। এরাটস্থেনিস প্রথম পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন এবং জ্যামিতি-ভিত্তিক মানচিত্ররূপ দেন। এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি হচ্ছে Ptolemy-এর Geographia, যেখানে গ্রিড-ভিত্তিক অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ পদ্ধতি প্রথম সুসংগঠিত রূপে উপস্থাপিত হয়।[১২]

২. রোমান ও পারসিক ভূগোল: রোমান সাম্রাজ্যের সামরিক-প্রশাসনিক প্রয়োজন মানচিত্রকে আরও বাস্তবধর্মী করে তোলে। রাস্তা, সামরিক ঘাঁটি ও বন্দর-নগরকেন্দ্রিক মানচিত্র ছিল এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পারসিক সাসানীয় প্রশাসনে ভৌগোলিক অঞ্চলবিন্যাস, নদী-নালা ও বাণিজ্যপথ চিত্রায়ণ মানচিত্রচর্চাকে সাংগঠনিক রূপ দেয়।

৩. ভারতীয় ও চীনা অবদান: ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গতি, নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান ও আকাশীয় চিত্র সংকলন করেছেন, যা মানচিত্র ও নৌযাত্রা উভয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চীনারা জ্যোতির্বিজ্ঞান, কাগজ ও কম্পাস আবিষ্কারের মাধ্যমে মানচিত্রকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নেন।[১৩]

৭.২ ভূগোলবিদদের অবদান ও নতুনত্ব

তৎকালীন টলেমির গ্রিড পদ্ধতি প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর প্রস্তুতকৃত ম্যাপ ভূগোলবিদগণকে তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাবলী ও জ্ঞানভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করা এবং মানচিত্রাংকন প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে। ধীরে ধীরে টলেমীয় ধারার ম্যাপের অনেক উন্নতি সাধিত হয় এবং পাশাপাশি আরব মানচিত্রাংকন ধারায় নতুন নতুন জ্ঞানের সংযোজন হতে থাকে। টলেমি ভূগোলচর্চায় অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ-নির্ভর গণনামূলক পদ্ধতি স্থাপন করেন। এটি পরবর্তী সব ইসলামী মানচিত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।[১৪]

৭.৩ নতুনত্ব

১. গণনামূলক মডেল, গোলাকার পৃথিবীর ভিত্তিতে মানচিত্র, ত্রিকোণমিতিক পরিমাপ, ৮,০০০-এর বেশি স্থানের স্থানাঙ্ক প্রদান।

২. এরাটস্থেনিসের পরিমাপ পদ্ধতি: তিনি পৃথিবীর বৃত্তাকার ধারণাকে বৈজ্ঞানিক পরিমাপের মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

৩. হিপারকাসের তারামণ্ডল মানচিত্র: এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নৌপরিবহনকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

৪. রোমান ইটিনারারি ম্যাপ: রোমানদের Tabula Peutingeriana ছিল দীর্ঘ পথনির্দেশ মানচিত্র, যা সামরিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারে বিপ্লব আনে।

৫. ভারত ও চীন: ভারতীয় নক্ষত্র-কক্ষপথভিত্তিক মানচিত্র: চীনের কাগজে অঙ্কিত সমন্বিত টপোগ্রাফিক মানচিত্র কম্পাস ব্যবহারের মাধ্যমে দিক নির্ণয়ে উন্নতি।[১৫]

৭.৪ শ্রেষ্ঠত্ব ও সংযোজন

১. গ্রিক-রোমান ধারা শাস্ত্রীয় ভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব: গ্রিকদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ রোমানদের প্রশাসনিক প্রয়োগের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বাস্তবসম্মত মানচিত্রচর্চা গড়ে তোলে।

২. পারসিক সংযোজন: পারসিক ভূগোলবিদরা ভৌগোলিক প্রশাসন, কৃষি-জলব্যবস্থাপনা, করব্যবস্থার মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যা পরবর্তী ইসলামী জিওগ্রাফিগুলিকে প্রভাবিত করে।

৩. ভারত-চীন প্রযুক্তিগত সংযোজন: বিশেষত কম্পাস, কাগজ, খচিত দিকচিহ্ন পরবর্তী ইসলামী মানচিত্রচর্চায় সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

৪. ভূগোলচিন্তার সংহতি: এ তিন ধারার জ্ঞান পরবর্তীতে ইসলামী স্বর্ণযুগে অনুবাদ, সারাংশ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক নতুন মানচিত্রজগতের জন্ম দেয়। আব্বাসীয় আমলে আল-খওয়ারিজমি, আল-মাস'ঊদী, ইবন হাওকাল, ইসতাখরী প্রমুখ যে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর দাঁড়ান, তা ছিল এই প্রাক-আব্বাসীয় উত্তরাধিকার।[১৬]

৭.৫ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ

সাদৃশ্য

১. পৃথিবীর গোলাকৃতি ধারণা: গ্রিক, ভারতীয় ও চীনা ধারায় পৃথিবী গোলাকার এ ধারণা সাধারণভাবে গৃহীত ছিল।

২. জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ: সব ধারাতেই নক্ষত্র-ভিত্তিক দিক নির্ণয় ছিল প্রচলিত।

৩. নৌপরিবহনকেন্দ্রিক মানচিত্র: বাণিজ্যিক রুট, সমুদ্রতট, বন্দর ও দ্বীপ ছিল মূল বিবরণ।

বৈসাদৃশ্য

১. পদ্ধতিগত পার্থক্য: গ্রিকরা গাণিতিক, ভারতীয়রা জ্যোতিষ শাস্ত্র, চীনারা টপোগ্রাফিক-বাস্তবধর্মী পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

২. উদ্দেশ্যের পার্থক্য: রোমান মানচিত্র মূলত প্রশাসনিক; গ্রিকদের মানচিত্র ছিল জ্ঞান-অন্বেষণমূলক; ভারত-চীন ছিল ধর্ম-জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক।

৩. প্রযুক্তিগত পার্থক্য: চীনের কাগজ, কম্পাস ও স্কেলিং-পদ্ধতি গ্রিকদের তুলনায় অধিক ব্যবহারিক ছিল।

আব্বাসীয়-পূর্ব যুগের মানচিত্রবিদ্যা ছিল বহুধারার সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য। গ্রিকদের গাণিতিক মডেল, রোমানদের বাস্তব প্রশাসনিক মানচিত্র, ভারত-চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞান-নির্ভর চিত্র ও পারসিকদের অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক-জলসম্পদ মানচিত্র মিলিত হয়ে এমন এক ভিত্তি সৃষ্টি করে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আব্বাসীয় স্বর্ণযুগে ভূগোল ও মানচিত্রচর্চা নবজাগরণের সঞ্চার করেছিল। এ যুগের ভূগোলবিদরা কেবল ভৌগোলিক স্থান চিত্রায়ণ করেননি, বরং মানবজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে উন্নীত করেছেন। তাদের নতুনত্ব, সংযোজন, শ্রেষ্ঠত্ব এবং আবিষ্কার পৃথিবী-জ্ঞানকে আরও সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপসিদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। সুতরাং বলা যায়, ইসলামী মানচিত্রচর্চার শিকড় গ্রিক-রোমান-পারসিক-ভারত-চীন প্রাক-ঐতিহাসিক গবেষণার গভীরে প্রোথিত; এবং আব্বাসীয় যুগ সেই শিকড়কে বিকশিত করে এক স্বতন্ত্র বৈশ্বিক মানচিত্রধারা প্রতিষ্ঠা করে।

৮. আব্বাসীয় আমলে মানচিত্রের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে ভূ-চিত্রাঙ্কণ বিদ্যানুশীলনের প্রচলন ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই ক্রমবর্ধমান মুসলিম বিশ্বের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশেষ বিদ্যানুশীলনের এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের (মৃত ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.) জন্য '*আদ্-দায়লামের*' মানচিত্র অঙ্কিত হয়। আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূরের আমলে অঙ্কিত (১৩৬-১৫৮ হি./ ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) বসরার জলাভূমির মানচিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[১৭]

আরবগণ প্রাথমিক অভিযানকালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক জ্ঞানার্জন করেন, তা মানচিত্র অঙ্কনের সমকালীন প্রাচীন পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত ছিল। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীর প্রথম দশকে গ্রিক, ভারতীয় এবং ইরানী জ্যোতির্বিদ্যা ও ভৌগোলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামী বিশ্বে অনুপ্রবেশের ফলে সর্বপ্রথম বিশদ বিস্তৃত আরবীয় বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কিত হয়। ৯ম শতাব্দী থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ভূচিত্রাঙ্কনবিদ্যার চর্চা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে এ বিদ্যার উন্নয়ন সাধিত হয়। মধ্যযুগে আধুনিক অঙ্কন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মুসলিম ভূগোলবেত্তা এবং জ্যোতির্বিদ্যাগণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্ব মানচিত্র, আঞ্চলিক ভূ-চিত্রাবলী ও সমুদ্র মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

৮.১ আব্বাসীয় খলীফার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের প্রথম মানচিত্র অঙ্কন

বিশ্বের প্রথম মানচিত্র ছিল '*সূরাতুল মামূনিয়্যা*', যা আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় *বায়তুল হিকমার* সুবিজ্ঞ গবেষকগণ প্রস্তুত করেছিলেন। এর মূল অনুলিপি বর্তমানে পাওয়া যায় না। এই মানচিত্রে বিশ্বভুবনের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তারকারাজি, স্থলভাগ ও সাগরমালা, জনবসতিপূর্ণ বা জনশূন্য অনাবাদী ভূমিসহ শহর নগরসমূহ চিত্রিত হয়েছে। উক্ত মানচিত্রের প্রত্যক্ষদর্শী আল-মাস'ঊদী এটিকে ক্লাডিয়াস টলেমী এবং মারিনুস প্রমুখের কর্তৃক অঙ্কিত পূর্ববর্তী বিশ্বমানচিত্রের তুলনায় অতি উৎকৃষ্ট মানের বলে অভিহিত করেছেন।[১৮]

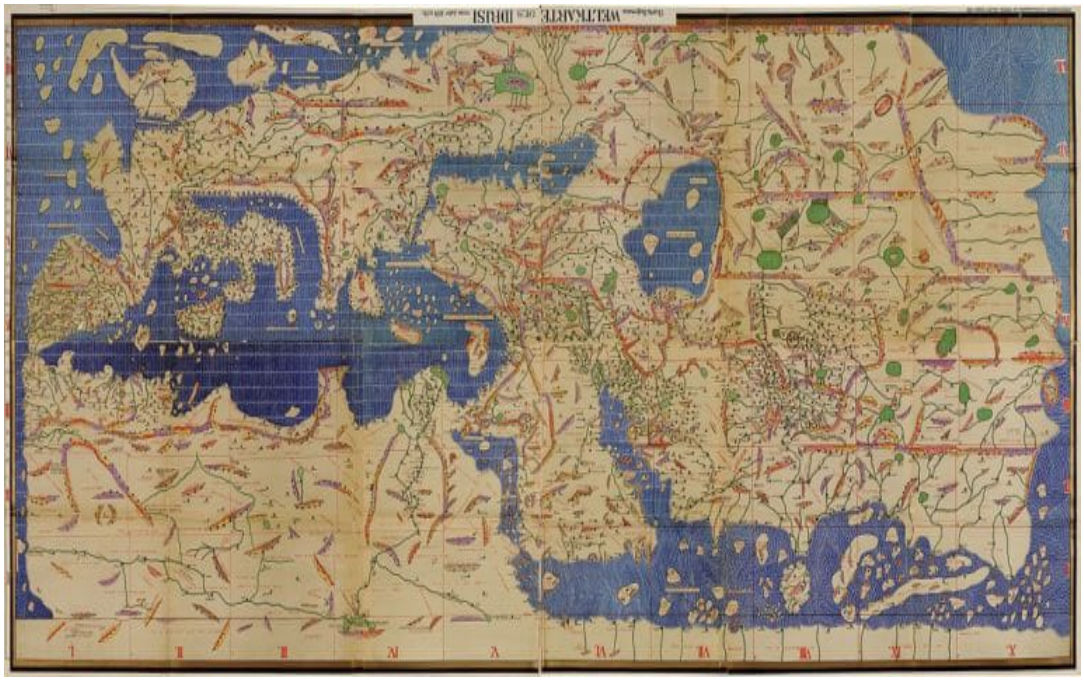

মাস'ঊদী কর্তৃক রচিত মানচিত্র

মাস'ঊদী কর্তৃক রচিত মানচিত্র

আয্-যুহরী এর মতানুসারে আল-ফাযারী '*সূরাতুল মামূনিয়্যা*' মানচিত্রের একটি অনুলিপি তৈরি করেন। আল-ফাযারী উক্ত মানচিত্রের একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এছাড়া আয্-যুহরীর স্বরচিত গ্রন্থ '*কিতাবুল জুগরাফিয়্যা*' '*সুরাতুল মামূনিয়্যা*'র অনুলিপির ভিত্তিতে ইরানী কিশওয়ার পদ্ধতিতে রচিত হয়।[১৯]

৮.২ আল-খাওয়ারিযমী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

আল-খাওয়ারিযমীর ভূগোল বিষয়ক '*সুরাতুল আরদ*' গ্রন্থে শহর-নগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির স্থানের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এ মানচিত্রের অস্তিত্বও বর্তমানে নেই। খাওয়ারিযমী '*জাযীরাতুল জাওহার*' নামক মানচিত্র নীলনদ ও আযোভ সমুদ্র এবং সাগর ও উপসাগর সম্পর্কিত মূল মানচিত্রের অনুসরণে অঙ্কিত এবং মুদ্রিত সংস্করণের চারটি মানচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

আল-খাওয়ারিযমীর '*সুরাতুল আরদ*' গ্রন্থে নীল নদের প্রাচীনতম মানচিত্র

সাবিত ইব্ন কুররাহ '*সিফাতুদ্-দুন্য়া*' নামক একটি বিশ্বমানচিত্র অঙ্কন করেন। যার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।[২০]

৮.৩ ইব্ন ইউনুস ও ইব্ন আহমাদ আল-মুহাল্লাবী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

দশম শতাব্দীতে ইব্ন ইউনুস এবং আল-হাসান ইব্ন আহমাদ আল-মুহাল্লাবী যৌথ প্রচেষ্টায় ফাতেমীয় খলীফা আল-আযীয (৩৬৫-৩৮৬ হি./৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.) এর জন্য একটি বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কন করেন। এ মানচিত্রটি তুসতারী রেশমী বস্ত্রের ওপর অঙ্কন করে স্বর্ণসূত্রের সাহায্যে নানা বর্ণের রেশম দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এ মানচিত্রে সমভূমি, পর্বতমালা, নদ-নদী, শহর-নগর, সাগরমালাসহ বিভিন্ন যাতায়াত পথ প্রদর্শিত হয়। এছাড়া পবিত্র মক্কা ভূমি ও মদীনা নগর চিত্রিত হয়। এজন্য ২২,০০০ দীনার ব্যয়িত হয়। আরবের দক্ষিণ পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূলের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য ব্যতিত আল-খাওয়ারিযমীর মানচিত্রের অনুরূপ।[২১]

৮.৪ আবূ যায়দ আল-বালখী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

আবূ যায়দ আল-বালখী (মৃ. ৩২২ হি./৯৩৪ খ্রি.) ইসলামী ভূচিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এক নূতন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেন; যা পরবর্তী ভূচিত্রাঙ্কনবিদদের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং মুসলিম বিশ্বে অতি জনপ্রিয় ভূচিত্রাঙ্কন পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়। আল-বালখী *'সুওয়ারুল আকালীম'* নামক মুসলিম বিশ্বের ভূগোল প্রণয়ন করেন। এতে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে হলেও প্রতিটি প্রদেশের সীমানাসহ প্রধান প্রধান শহর, নগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ অঙ্কন করেন। এছাড়া তিনি ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মানচিত্র অঙ্কন করেন। এ মানচিত্রে মক্কা নগরীকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বালখীর ভৌগোলিক রচনাসম্ভার বা মানচিত্রাবলীর কোনো কিছুই আজ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিদ্যমান নেই।[২২]

আল-বালখী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র; Image Source: The Muslim Times

৮.৫ আল-ইসতাখরী ও ইব্ন হাওকাল কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

আল-ইসতাখরী ২১টি প্রাদেশিক মানচিত্র অঙ্কন করেন। তন্মধ্যে একটি বিশ্ব মানচিত্রও রয়েছে। উক্ত মানচিত্রগুলো তাঁর রচিত গ্রন্থ *'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক'* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের সুবিখ্যাত ভূগোলবিদ ইব্ন হাওকাল মুসলিম বিশ্বের অতি উৎকৃষ্ট ভূগোল গ্রন্থ *'কিতাবু সূরাতিল আরদ'* প্রণয়ন করেন। তিনি তার গ্রন্থের প্রয়োজনেই বালখীর ভূচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি বিশ্ব মানচিত্রসহ ২২টি মানচিত্র অঙ্কন করেন।[২৩]

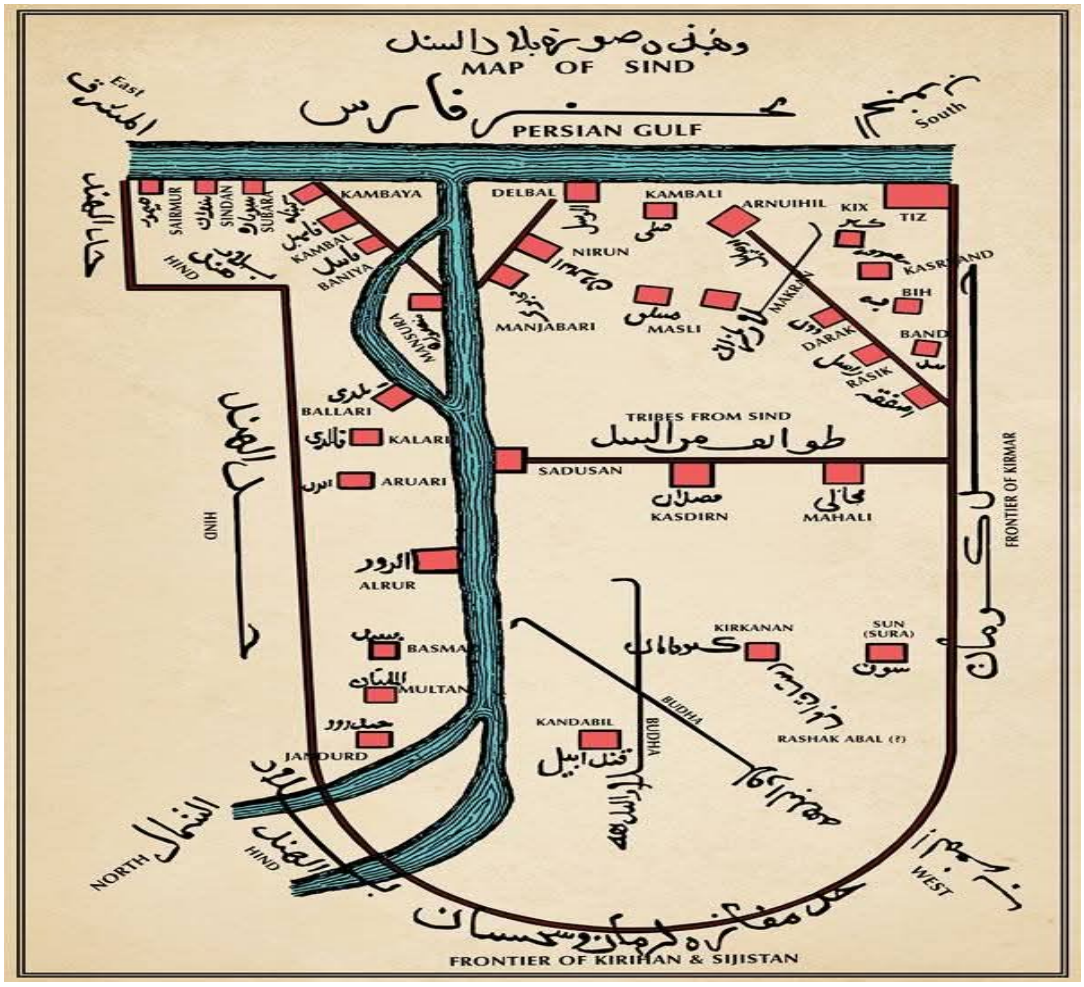

দ্বাদশ শতাব্দীতে অজ্ঞাত এক লেখকের *'মুখতাছার ইব্ন হাওকাল'* নামে একটি বিশ্ব মানচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ মানচিত্রে জনমানব অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে গোলাকৃতির পরিবর্তে ডিম্বাকৃতিরূপে অঙ্কন করেন। এতে ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে নীলনদের উৎসমুখে সংকীর্ণ যোজক দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। আংশিকভাবে প্রদর্শিত *(Terra Incognita)* (অজ্ঞাত পৃথিবী) দ্বারা সংযোজিতরূপে অঙ্কন করা হয়েছে।

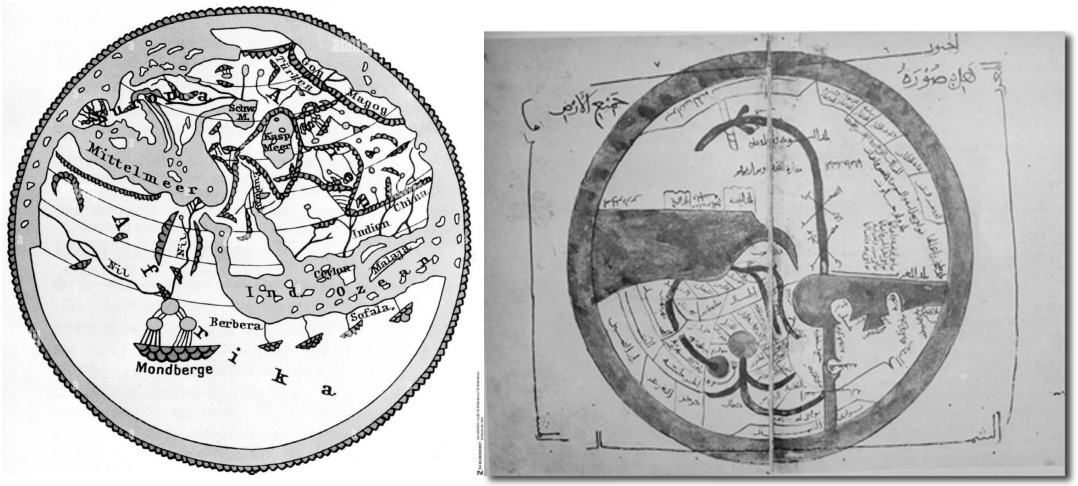

ইব্ন হাওকাল কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

৮.৬ আল-মাকদিসী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

আব্বাসীয় আমলের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ভূগোলবিদ আল-মাকদিসী '*আহ্সানুত্-তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম*' গ্রন্থে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের বিধিবদ্ধ বিবরণী প্রদান করেছেন। তিনি প্রদেশসমূহকে পূর্ণবিন্যাস করতে ১২ টি মানচিত্র অঙ্কন করেন। আল-মাকদিসী তার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নাবিকদের সাক্ষাত সংস্পর্শজাত বিবরণীর ভিত্তিতে আরব ভূ-খণ্ডের চতুষ্পার্শস্থ সাগরমালার অধিকতর নিখুঁত মানচিত্র অঙ্কন করেছেন।

৮.৭ ইব্ন নাসর আল-জায়হানী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

সামানী উযীর আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-জায়হানী কতিপয় মানচিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ছিলেন আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক গ্রন্থের প্রণেতা। তবে তার মানচিত্রসমূহ স্বহস্তে অঙ্কিত ছিল না বলে অনুমান করা হয়। কেননা তিনি তার গ্রন্থে সপ্ত আবহাওয়া মহাদেশের বর্ণনায় টলেমীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অজ্ঞাত লেখক আবূ জা'ফর আল-খাযিনের মানচিত্রের সংশোধিত সংস্করণ হিসেবে '*হুদূদুল আ'লাম*' (জগতের সীমানা) প্রণয়ন করেন।[২৪]

৮.৮ আল বিরূনী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

আল বিরূনী যদিও আমাদের কাছে ঐতিহাসিক হিসেবে অধিক পরিচিত, কিন্তু তার ভৌগোলিক গবেষণাও ভূগোল শাস্ত্রকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রতিভাবান গবেষক জোয়ার-ভাঁটার হ্রাস-বৃদ্ধি ও চন্দ্রের সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় ও আরও অন্যান্য বিষয়ে যেসব বিজ্ঞানসম্মত তথ্য তুলে ধরেছিলেন, তার গুরুত্ব আজও আধুনিক ভূগোলবিদরা স্বীকার করেন।

আল-বিরূনী নতুন ধ্যান-ধারণা প্রবর্তন সহকারে সামুদ্রিক মানচিত্র অঙ্কন করেন। উক্ত মানচিত্রে *Terra Incognita* নামক অজ্ঞাত ভূ-খণ্ডের পরিবর্তে সুবৃহৎ সাগর অঙ্কন করা হয়েছে। যা প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। এ মানচিত্রে আল-বিরূনী ভারত মহাসাগরকে আটলান্টিকের সাথে সংযুক্ত দেখান এবং আফ্রিকাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতিতে অঙ্কন করা হয়েছে।[২৫]

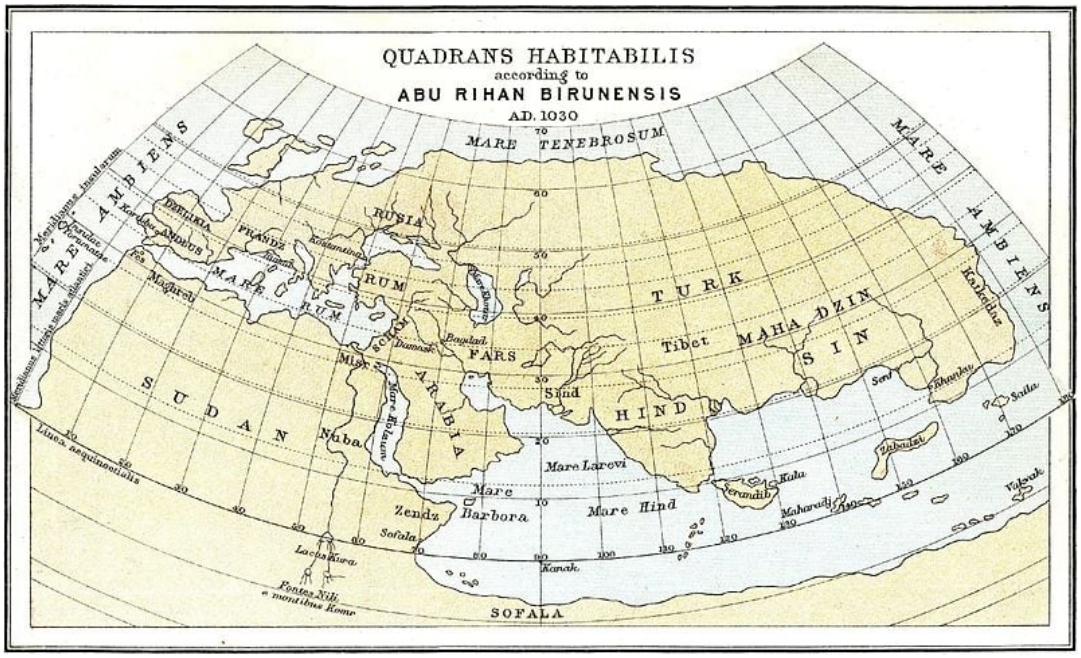

আল-বিরূনী কর্তৃক অঙ্কিত এশিয়া অঞ্চলের মানচিত্র; Image Credit: MAPS ETC

একদশ শতাব্দীতে মাহমূদ আল-কাশগারী বৈচিত্রময় একটি বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কন করেন। যাতে তুর্কী ভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে কাশগারকে মানচিত্রের কেন্দ্রস্থলে অঙ্কন করা হয়েছে।

৮.৯ ভূগোলবিদ আল-ইদরীসী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

সিসিলীতে আশ্-শারীফ আল-ইদরীসী অনেকগুলো আঞ্চলিক ও বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কন করেন। টলেমীয় মানচিত্রকে ভিত্তি করে তিনি একটি সুবৃহৎ 'রজত নির্মিত' মানচিত্র অঙ্কন করেন। এছাড়া তিনি এমন একটি বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কন করেন, যাতে সপ্ত আবহাওয়া প্রত্যেকটি দশ দ্রাঘিমাংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অংশের পৃথক পৃথক মানচিত্র অঙ্কন করেন।

আল-ইদরীস কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

মধ্যযুগে মুসলিম ভূগোলবিদ এবং মানচিত্রকার আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ইদরীস পৃথিবীর একটি মানচিত্র আঁকেন। ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ আঁকা ট্যাবুলা রোজারিয়ানা *(Tabula Rogeriana)* নামে পৃথিবীর এই মানচিত্রটি প্রায় ৩০০ বছর ধরে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি ক্রিস্টোফার কলম্বাস এবং ভাসকো ডা গামা এর মত বড় বড় অনুসন্ধানকারীরাও তাদের অনুসন্ধান কাজে ব্যবহার করেছিল। এছাড়াও তার এই অনন্য কীর্তি ইব্ন বতুতা, ইব্ন খালদুন এর মত অনেক মুসলিম ভূগোলবিদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। মানচিত্রটিতে তিনি নকশার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ এবং সঠিকভাবে সাগর, হ্রদ, নদী ইত্যাদির অবস্থান তুলে ধরেছেন যেগুলোর অনেক অংশ আজও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মানচিত্রে তিনি সারা পৃথিবীকে ৭টি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন। মানচিত্র ছাড়াও তাঁর অনন্য আরেক কীর্তি হচ্ছে *'নুজহাত আল-মুশতাক'* নামে তাঁর রচিত গ্রন্থ। যেটি মোট ৯ টি ম্যানুস্ক্রিপ্টে লিখিত। যার মধ্যে ৭ টিই মানচিত্র। পরবর্তীতে বইটি নানান ভাষায় অনূদীত হয়েছে।[২৬]

৮.১০ আহমাদ আত্-তূসী কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র

সুপ্রাচীন মুসলিম ভূতত্ত্ববিদদের অন্যতম আহমাদ আত্-তূসী। ফারসী ভাষায় রচিত *'আজাইবিল মাখলুকাত'* (৫৭৬ হি./১১৮০ খ্রি.) গ্রন্থে ছয়টি মানচিত্রের বর্ণনা রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে কাপিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, আল-জিবাল, আস্-সিন্দ এবং পারস্য উপসাগরসমূহের মানচিত্রগুলোও স্থান পেয়েছে।[২৭] এছাড়া পরবর্তীতে আরও কিছু মানচিত্র অঙ্কিত হয়, যেগুলো আজকের আধুনিক মানচিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

৯. উপসংহার

কালের আবর্তে মানচিত্র অঙ্কন মনুষ্য জাতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির যাতায়াত ও পরিভ্রমণের ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য আদিম জনগোষ্ঠীর পথ-ঘাট নির্ধারণ ও দিক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকেই প্রাথমিকভাবে মানচিত্র অঙ্কনের ধারণা জন্ম নেয়। পরবর্তীতে আব্বাসীয় আমলে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নের ফলে মানচিত্র অঙ্কনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মুসলিম ভূগোলবিদরা গ্রিক জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন মানচিত্র তৈরি করেন এবং পুরনো মানচিত্রের সংশোধন করেন। আব্বাসীয় খলীফাগণ মুসলমানদের কিবলা নির্ধারণ ও হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মানচিত্রাঙ্কনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এর ফলে মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যায় নতুন মাত্রায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের তৈরি মানচিত্রসমূহ কেবল ভৌগোলিক অঞ্চলের চিত্রণ ছিল না বরং জ্যোতির্বিদ্যা, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ এবং অন্যান্য গাণিতিক ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হতো। তাই বলা যায়, আব্বাসীয় আমল তথা মুসলিম মানচিত্রাঙ্কনের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। একসময় উক্ত খিলাফতের পতন ঘটলেও তৎকালীন মুসলমানদের মানচিত্রাঙ্কনের ঐতিহ্য মুসলিম বিশ্বে ও পরবর্তীতে ইউরোপেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] সালাহ উদ্দীন উসমান হাশিম, *তারীখুল আদাবিল জুগরাফিল আরাবী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: ইদারাতুছ ছাকাফিয়্যাহ্, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ৫৯ ।

[২] ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী ও ড. হামিদ সাদিক কা'নাবী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি), পৃ. ১৯৫; লূইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম* (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ৪০ তম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ১৭৪; ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ইউপি: কুতুব খানা হুসাইনিয়া, তা.বি.), পৃ. ২২৮।

[৩] ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ২২৮।

[৪] আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৭।

[৫] John Small and Michael Witherick, *A Modern Dictionary of Geography* (London: Edward Arnold, 3rd edition,1995), p. 149.

[৬] Definition of Surveying, *Mapping and Related Terms (*New York: American Society of Civil Engineers, 1954), p. 454.

[৭] মুহাম্মদ মকবুল হুসেন, *ব্যবহারিক ভূগোল* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫২-৫৩।

[৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৬।

[৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

[১০] পূর্বোক্ত, পৃ.৫০-৫১।

[১১] নাফিস আহমাদ, *ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, অনুবাদ: মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭২-৭৪।

[১২] S. E. Johnson, *Persian Administrative Geogr*aphy (London: Routledge, 1979), p. 45.

[১৩] Ping-Yü Ho, *The Astronomical Tradition in China* (Beijing: Academia Press, 1988), Pp. 112–118, 151.

[১৪] Talbert, *R. Rome's World: The Peutinger Map Reconsidered* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), pp. 33-40.

[১৫] Ibid.

[১৬] S. E. Johnson, *Persian Administrative Geography,* p. 47.

[১৭] শাওকাত ইবরাহীম, *খারাইত জুগরাফিয়্যিল আরাব আল-আওয়াল*, *মাজাল্লাতুল উসতায লিল উ'লূমিল ইনসানিয়্যাহ্ ওয়াল ইজতিমা'ইয়্যাহ্* (বাগদাদ: জামি'আহ্ বাগদাদ, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২-৩; Ignati Iulianovich Krachkovski, *Istoria arabskoi Geograficheskoi Literatury,* Translated into Arabic (Moscow-Leninograd: 1957), pP. 59, 206.

[১৮] সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩৭৮।

[১৯] আয্-যুহরী, *কিতাবুল জুগরাফিয়্যাহ্*, তাহকীক: মুহাম্মাদ হাজী সাদিক (দিমাশ্ক: মাকতাবাতুছ ছাকাফাতিদ্-দীনীয়্যাহ্, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ.৩০৬; Ignati Iulianovich Krachkovski, *Istoria arabskoi Geograficheskoi Literatury,* pp. 86-87, 279.

[২০] সালাহউদ্দীন উসমান হাশিম, *তারীখুল আদাবিল জুগরাফিল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

[২১] শাওকাত ইবরাহীম, 'খারাইত জুগরাফিয়্যিল আরাব আল-আওয়াল', মাজাল্লাতুল উসতায লিল উ'লূমিল ইনসানিয়্যাহ্ ওয়াল ইজতিমা'ইয়্যাহ্, পৃ. ১২-১৩।

[২২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০।

[২৩] ইবন হাওকাল, *কিতাবু সূরাতিল আরদ*, ২য় খণ্ড (লাইডেন: ১৯৩৯ খ্রি.), পৃ.৩২৯-৩৩০।

[২৪] সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৮০-৬৮১।

[২৫] আল-বিরূনী, *তাহ্দীদ নিহায়াতিল আমাকিন লিতাসহীহ্ মাসাফাতিল মাসাকিন* (বৈরূত: ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৪৭।

[২৬] ইসলামিক হিস্টরি ইন্সটিউট, উইকিপিডিয়া, হিস্টরি অফ ইনফরমেশন।

[২৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৮২।